

বর্ধমান ও হুগলী জেলায় সাঁওতাল নারীদের আর্থ - সামাজিক ও শিক্ষার ক্রম বিবর্তন (১৯৫১-২০১১)

প্রেমানন্দ মুরমু

সহকারী অধ্যাপক ও গবেষক (B. U)

ইতিহাস বিভাগ, চন্দ্রপুর কলেজ, চন্দ্রপুর, পূর্ব বর্ধমান, প. ব

Email: premanandamurmu@gmail.com

সারসংক্ষেপ (Abstract)

এই গবেষণায় ১৯৫১ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত বর্ধমান ও হুগলী জেলায় সাঁওতাল নারীদের আর্থ-সামাজিক ও শিক্ষাগত অবস্থার ক্রমবিবর্তন বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সাঁওতাল সম্প্রদায় পূর্ব ভারতের অন্যতম বৃহৎ আদিবাসী গোষ্ঠী, যারা ঐতিহাসিকভাবে সামাজিক বঞ্চনা, দারিদ্র্য এবং শিক্ষার সীমিত সুযোগের সম্মুখীন হয়েছে। এই গবেষণায় ঐতিহাসিক-সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতির মাধ্যমে ছয় দশকের পরিবর্তনকে অনুসরণ করা হয়েছে এবং জনগণনা তথ্য, সরকারি প্রতিবেদন ও গৌণ উৎসের উপর ভিত্তি করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

স্বাধীনতার পরবর্তী প্রারম্ভিক পর্যায়ে সাঁওতাল নারীরা মূলত জীবিকাভিত্তিক কৃষিকাজ ও অনানুষ্ঠানিক শ্রমে নিয়োজিত ছিলেন। সেই সময়ে তাদের সাক্ষরতার হার ছিল অত্যন্ত কম এবং প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় অংশগ্রহণও ছিল সীমিত। তবে সময়ের সাথে সাথে বিভিন্ন সরকারি কল্যাণমূলক কর্মসূচি, ভূমি সংস্কার এবং আদিবাসী উন্নয়ন প্রকল্পের প্রভাবে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার কিছু উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বৃদ্ধি, অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীতে অংশগ্রহণ নারীদের ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

তবে এই অগ্রগতি সর্বত্র সমানভাবে ঘটেনি। যদিও সাঁওতাল নারীদের মধ্যে সাক্ষরতার হার ও শিক্ষায় অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে, তবুও দারিদ্র্য, অল্পবয়সে বিবাহ, লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য এবং উচ্চশিক্ষায় সীমিত প্রবেশাধিকার এখনও বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে। বর্ধমান ও হুগলী জেলার নগরায়ণ ও শিল্পায়ন একদিকে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে, অন্যদিকে নতুন ধরনের অনিশ্চয়তা ও ঝুঁকিও তৈরি করেছে।

সর্বোপরি, এই গবেষণায় দেখা যায় যে ১৯৫১ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সত্ত্বেও সাঁওতাল নারীদের আর্থ-সামাজিক ও শিক্ষাগত উন্নয়ন এখনও অসম্পূর্ণ। সমতাভিত্তিক উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায় নিশ্চিত করতে দীর্ঘমেয়াদি ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতিগত উদ্যোগ অপরিহার্য।

মূল শব্দ (Keywords): সাঁওতাল নারী, আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন, শিক্ষাগত উন্নয়ন, বর্ধমান ও হুগলী, আদিবাসী সমাজ

1. ভূমিকা (Introduction)

ভারতের অন্যতম বৃহত্তম আদিবাসী গোষ্ঠী-সাঁওতাল সম্প্রদায়-প্রধানত পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা এবং বিহারের মতো পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোতে কেন্দ্রীভূত। পশ্চিমবঙ্গে, বর্ধমান এবং হুগলির মতো জেলাগুলোতে ঐতিহাসিকভাবেই সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং শক্তিশালী গোষ্ঠীগত বন্ধন থাকা সত্ত্বেও, সাঁওতালরা দীর্ঘকাল ধরে আর্থ-সামাজিকভাবে প্রান্তিক অবস্থানে রয়ে গেছে; বিশেষ করে নারীরা, যারা তাদের লিঙ্গ পরিচয় এবং আদিবাসী পরিচয়ের কারণে দ্বিমুখী বঞ্চনার শিকার।

১৯৫১ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত সময়কালটি সাঁওতাল নারীদের সামাজিক মর্যাদার রূপান্তর বোঝার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; কারণ এই সময়ের মধ্যেই ভারতে স্বাধীনতার পরবর্তী উন্নয়ন নীতিসমূহ, ভূমি সংস্কার, শিল্পায়ন এবং শিক্ষার প্রসার ঘটেছিল। প্রাথমিকভাবে, সাঁওতাল নারীরা মূলত জীবনধারণ-নির্ভর কৃষি, বনজ সম্পদ-ভিত্তিক কার্যক্রম এবং অসংগঠিত শ্রম খাতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলেন। আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় তাঁদের অংশগ্রহণ ছিল অত্যন্ত সীমিত; দারিদ্র্য, সামাজিক বাধা এবং প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ-সুবিধার অভাবের কারণে তাঁদের মধ্যে শিক্ষার হার ছিল অত্যন্ত কম।

গত কয়েক দশক ধরে, আদিবাসী কল্যাণ প্রকল্প, প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার এবং নারী ক্ষমতায়ন কর্মসূচির মতো বিভিন্ন সরকারি উদ্যোগ তাঁদের অবস্থার উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালিয়েছে। আর্থ-সামাজিক গতিশীলতা বা উন্নতির ক্ষেত্রে শিক্ষা একটি মূল নিয়ামক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে; যা সচেতনতা বৃদ্ধি, উন্নত জীবিকার সুযোগ সৃষ্টি এবং নারীদের ক্রমান্বয়ে ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে, সাঁওতাল নারীদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার কেবল তাঁদের আয়ের স্তরই বৃদ্ধি করে না, বরং পারিবারিক কল্যাণ এবং সামগ্রিক গোষ্ঠী উন্নয়নের ওপরও ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে।

তবে, এই পরিবর্তনের প্রক্রিয়াটি ছিল অসম এবং জটিল। বর্ধমান ও হুগলি জেলায় শিল্পায়নের ফলে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হলেও, এর পাশাপাশি তা বাস্তবচ্যুতি, অভিবাসন এবং আর্থ-সাংস্কৃতিক বিশৃঙ্খলারও জন্ম দিয়েছে। সাঁওতাল নারীরা প্রায়শই স্বল্প-বেতনের অসংগঠিত পেশায় নিয়োজিত থাকেন এবং নিরক্ষরতা, স্বাস্থ্যহীনতা, লিঙ্গ-বৈষম্য ও উচ্চশিক্ষার সীমিত সুযোগের মতো নানাবিধ ধারাবাহিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হন। তাঁদের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি তাঁদের স্বাস্থ্য, প্রজনন হার এবং সামগ্রিক সুস্থ-স্বাচ্ছন্দ্যের ওপর ক্রমাগত প্রভাব বিস্তার করে চলেছে—যা উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকের পারস্পরিক আন্তঃসম্পর্কেই স্পষ্টভাবে তুলে ধরে।

তাছাড়া, সাঁওতাল সম্প্রদায়ের অভ্যন্তরে প্রচলিত প্রথাগত আর্থ-সাংস্কৃতিক রীতিনীতিগুলো অনেক সময় নারীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া এবং জনজীবনে অংশগ্রহণের সুযোগকে সংকুচিত করে ফেলে, যার ফলে তাঁদের ক্ষমতায়নের পথ রুদ্ধ হয়ে পড়ে। সাংবিধানিক সুরক্ষা এবং বিভিন্ন নীতিগত পদক্ষেপ গ্রহণ করা সত্ত্বেও, কাঠামোগত বৈষম্যগুলো এখনো বিদ্যমান রয়েছে—যা তাঁদের সামগ্রিক উন্নয়নের গতিপথকে প্রভাবিত করে চলেছে। এই গবেষণার লক্ষ্য হলো ১৯৫১ থেকে ২০১১ সালের মধ্যবর্তী সময়ে বর্ধমান ও হুগলি জেলায় সাঁওতাল নারীদের আর্থ-সামাজিক ও শিক্ষাগত অবস্থার ক্রমবিকাশ পর্যালোচনা করা। দীর্ঘমেয়াদী পরিবর্তনসমূহ বিশ্লেষণের মাধ্যমে এটি অর্জিত অগ্রগতি এবং বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ-উভয়কেই অনুধাবনের প্রয়াস পায়; আর এর মধ্য দিয়েই এটি ভারতে আদিবাসী নারীদের উন্নয়নের বিষয়ে একটি অধিকতর সামগ্রিক বোঝাপড়া গড়ে তুলতে অবদান রাখে।

2. সাহিত্য পর্যালোচনা (Review of Literature)

সাম্প্রতিক গবেষণাসমূহ (২০১০-২০২৫) সাঁওতাল সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক ও শিক্ষাগত পরিস্থিতি ব্যাপকভাবে অনুসন্ধান করেছে, যেখানে লিঙ্গ বৈষম্যের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সম্পা দাস (২০১৭) জোর দিয়ে বলেছেন যে, সাঁওতাল নারীদের ক্ষমতায়ন এবং তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে; যদিও এই ক্ষেত্রে অগ্রগতির গতি এখনও মন্থর এবং অসম।

মালাকার ও রায় (২০১৭) সাঁওতাল নারীদের ক্ষেত্রে আর্থ-সামাজিক উপাদান এবং প্রজনন হারের মধ্যকার সম্পর্কটি পরীক্ষা করেছেন। তাঁরা তুলে ধরেছেন যে, শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক মর্যাদা স্বাস্থ্যগত ফলাফল ও জনমিতিক বিন্যাসকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করে। একইভাবে, স্টিলার প্রমুখ (২০২০) মাতৃপুষ্টি এবং শিশু-খাওয়ানোর রীতির ওপর আলোকপাত করেছেন। তাঁদের গবেষণায়

সাঁওতাল নারীদের মধ্যে ব্যাপক অপুষ্টি ও স্বাস্থ্যগত চ্যালেঞ্জের বিষয়টি উন্মোচিত হয়েছে, যার মূল কারণ হিসেবে দারিদ্র্য এবং সচেতনতার অভাবকেই দায়ী করা হয়েছে।

রায় (২০১৫) সাঁওতালদের আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশগত পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, সাঁওতালরা মূলত কৃষি ও বনজ সম্পদের ওপর নির্ভরশীল, যা তাদের স্বাস্থ্য ও জীবিকা নির্বাহের ধরনকে প্রভাবিত করে। ফারাবি (২০২৩) সাঁওতাল নারীদের ক্ষমতায়নে শিক্ষার ভূমিকার ওপর আলোচনা করেছেন; তবে একই সাথে তিনি এমন কিছু সাংস্কৃতিক বাধার কথাও উল্লেখ করেছেন, যা সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে তাদের অংশগ্রহণকে সীমিত করে রাখে।

সোরেন প্রমুখ (২০২৩) পশুপালন পেশায় নিয়োজিত সাঁওতাল নারীদের আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে গবেষণা করেছেন। তাঁরা এই নারীদের জীবিকার মানোন্নয়নে যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং সম্প্রসারণ সেবার গুরুত্বের ওপর জোর দিয়েছেন। ভুঁইয়া (২০২৫) শিক্ষার ক্ষেত্রে বিদ্যমান লিঙ্গ বৈষম্যের বিষয়টি অনুসন্ধান করেছেন এবং দেখিয়েছেন যে, বিভিন্ন নীতিগত পদক্ষেপ গ্রহণ করা সত্ত্বেও এই বৈষম্য বা অসমতা এখনও অব্যাহত রয়েছে।

দত্ত ও সতী (২০২৫) তাঁদের গবেষণায় দেখেছেন যে, সাঁওতাল সম্প্রদায়গুলো এখনও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে পিছিয়ে রয়েছে—বিশেষ করে শিক্ষা, আয় এবং অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধার বিচারে। ঘোষ ও অধিকারী (২০২৫) আরও প্রমাণ করেছেন যে, সাঁওতালদের স্বাস্থ্য এবং শারীরিক বিকাশের ওপর তাদের আর্থ-সামাজিক মর্যাদার একটি সুগভীর প্রভাব রয়েছে।

সামগ্রিকভাবে বলা যায়, বিদ্যমান গবেষণাসমূহ থেকে এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সাঁওতাল নারীদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে ধীরগতিতে হলেও কিছুটা উন্নতি সাধিত হচ্ছে; তবে একই সাথে এই ক্ষেত্রগুলোতে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ বা প্রতিবন্ধকতাও এখনও বিদ্যমান।

3. গবেষণার উদ্দেশ্যসমূহ (Objectives of the Study)

বর্তমান গবেষণাটি বর্ধমান ও হুগলি জেলার সাঁওতাল নারীদের আর্থ-সামাজিক ও শিক্ষাগত অবস্থার দীর্ঘমেয়াদী রূপান্তর অন্বেষণের লক্ষ্যে প্রণীত হয়েছে, যা ১৯৫১ থেকে ২০১১ সালের মধ্যবর্তী সময়কালকে অন্তর্ভুক্ত করে। গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ:

১. সাঁওতাল নারীদের ঐতিহাসিক আর্থ-সামাজিক অবস্থা পর্যালোচনা করা (১৯৫১-১৯৭১) :

এই উদ্দেশ্যটি স্বাধীনতা-পরবর্তী প্রাথমিক পর্যায়ে সাঁওতাল নারীদের প্রথাগত জীবিকা নির্বাহের ধরণ, অর্থনৈতিক ভূমিকা এবং সামাজিক মর্যাদা অনুধাবনের ওপর আলোকপাত করে। এর লক্ষ্য হলো কৃষি, বনজ সম্পদ এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমের ওপর তাদের নির্ভরতার স্বরূপ বিশ্লেষণ করা।

২. সময়ের সাথে সাথে শিক্ষাগত অবস্থার পরিবর্তন বিশ্লেষণ করা:

এর অন্তর্ভুক্ত হলো বিভিন্ন দশকে সাঁওতাল নারীদের মধ্যে সাক্ষরতার হার, বিদ্যালয়ে ভর্তি, ঝরে পড়ার ধরণ এবং উচ্চশিক্ষায় প্রবেশের সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত বিষয়গুলো অধ্যয়ন করা।

৩. উন্নয়ন নীতি ও কল্যাণমূলক কর্মসূচির প্রভাব মূল্যায়ন করা:

এই গবেষণার লক্ষ্য হলো মূল্যায়ন করা যে, উপজাতি কল্যাণ প্রকল্প, ভূমি সংস্কার এবং শিক্ষানীতির মতো সরকারি উদ্যোগগুলো সাঁওতাল নারীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কীভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে।

৪. সাঁওতাল নারীদের মুখোমুখি হতে হওয়া চ্যালেঞ্জ ও সীমাবদ্ধতাসমূহ চিহ্নিত করা:

এই উদ্দেশ্যটি দারিদ্র্য, লিঙ্গ বৈষম্য, বাল্যবিবাহ, সচেতনতার অভাব এবং কর্মসংস্থানের সীমিত সুযোগের মতো বিষয়গুলোর ওপর গুরুত্ব আরোপ করে, যা তাদের উন্নয়নের পথে ক্রমাগত বাধা সৃষ্টি করে চলেছে।

৫. আর্থ-সামাজিক রূপান্তরের সামগ্রিক ধরণ মূল্যায়ন করা (১৯৫১-২০১১):

গবেষণাটি বিভিন্ন সময়কালের একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ প্রদানের প্রয়াস পায়, যাতে অর্জিত অগ্রগতির মাত্রা এবং বিদ্যমান বৈষম্যগুলোর স্থায়িত্ব সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা যায়।

4. গবেষণা পদ্ধতি (Research Methodology)

বর্তমান গবেষণাটি সম্পূর্ণরূপে মাধ্যমিক তথ্যের (Secondary data) ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত এবং এতে একটি ঐতিহাসিক ও বিশ্লেষণাত্মক গবেষণা নকশা অনুসরণ করা হয়েছে। মাধ্যমিক তথ্যসমূহ বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে; যার মধ্যে রয়েছে ভারতের আদমশুমারি প্রতিবেদন (১৯৫১-২০১১), সরকারি প্রকাশনা, জেলা পরিসংখ্যান নির্দেশিকা, গবেষণাপত্র (জার্নাল), বই এবং সাঁওতাল সম্প্রদায় সম্পর্কিত পূর্ববর্তী গবেষণাসমূহ।

এই গবেষণায় গুণগত ও পরিমাণগত-উভয় ধরণের পদ্ধতিই প্রয়োগ করা হয়েছে। সাক্ষরতার হার, পেশাগত ধরণ এবং জনমিতিক সূচকের মতো পরিমাণগত তথ্যসমূহ বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে

তুলনামূলক ও প্রবণতা বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে, যাতে সময়ের সাথে ঘটে যাওয়া পরিবর্তনগুলো পরীক্ষা করা যায়। অন্যদিকে, গবেষণাপত্র ও প্রতিবেদন থেকে প্রাপ্ত বর্ণনামূলক বিবরণসহ বিভিন্ন গুণগত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে সাঁওতাল নারীদের আর্থ-সাংস্কৃতিক উপাদান, লিঙ্গীয় ভূমিকা এবং তাদের বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতাসমূহ ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে। ছয় দশক জুড়ে আর্থ-সামাজিক ও শিক্ষাগত অবস্থার বিবর্তনকে অনুধাবনের লক্ষ্যে একটি দীর্ঘমেয়াদী বা কালানুক্রমিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা হয়েছে। বিভিন্ন সময়ের মধ্যকার তুলনামূলক বিশ্লেষণ অগ্রগতি ও স্থবিরতার গতিপ্রকৃতি শনাক্ত করতে সহায়তা করে। শিক্ষা, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য এবং লিঙ্গবৈষম্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো পর্যালোচনার জন্য এই গবেষণায় বিষয়ভিত্তিক বিশ্লেষণও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

একাধিক উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য যাচাইয়ের মাধ্যমে গবেষণালব্ধ ফলাফলের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'ডেটা ট্রায়াঙ্গুলেশন' (তথ্য-ত্রিভুজায়ন) পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। তবে, বিশেষত ক্ষুদ্র বা স্থানীয় পর্যায়ে মাধ্যমিক তথ্যের প্রাপ্যতা ও সামঞ্জস্যহীনতার কারণে এই গবেষণার পরিসর কিছুটা সীমাবদ্ধ।

সামগ্রিকভাবে, এই গবেষণাপদ্ধতির মূল লক্ষ্য হলো নির্বাচিত জেলাসমূহে সাঁওতাল নারীদের পরিবর্তনশীল অবস্থার বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ ও সুশৃঙ্খল ধারণা প্রদান করা।

5. গবেষণার তাৎপর্য (Significance of the Study)

এই গবেষণাটির উল্লেখযোগ্য একাডেমিক, সামাজিক এবং নীতিগত প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে; কারণ এটি ভারতীয় সমাজের একটি প্রান্তিক ও স্বল্প-প্রতিনিধিত্বশীল গোষ্ঠী-সাঁওতাল নারীদের-দীর্ঘমেয়াদী রূপান্তরের ওপর আলোকপাত করে। ১৯৫১ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত সময়কালটি পর্যালোচনার মাধ্যমে, এই গবেষণাটি উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে, যা কাঠামোগত পরিবর্তনসমূহ এবং বিদ্যমান বৈষম্যগুলো সম্পর্কে গভীরতর উপলব্ধিতে সহায়তা করে।

একাডেমিক দৃষ্টিকোণ থেকে, এই গবেষণাটি নির্দিষ্ট অঞ্চল-ভিত্তিক গবেষণার শূন্যস্থান পূরণ করার মাধ্যমে সমাজবিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান, লিঙ্গ-গবেষণা এবং আদিবাসী অধ্যয়ন-এই ক্ষেত্রগুলোতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। যদিও বিভিন্ন গবেষণায় আদিবাসী সম্প্রদায়গুলোকে নিয়ে অনুসন্ধান চালানো হয়েছে,

তবুও বর্ধমান ও হুগলির মতো নির্দিষ্ট জেলাগুলোতে সময়ের সাথে সাথে ঘটে যাওয়া দীর্ঘমেয়াদী পরিবর্তনগুলোর ওপর আলোকপাত করেছে—এমন গবেষণার সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম।

সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে, এই গবেষণাটি সাঁওতাল নারীদের মুখোমুখি হওয়া বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ—যার মধ্যে রয়েছে দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা এবং লিঙ্গ-বৈষম্য—সেগুলোকে বিশেষভাবে তুলে ধরে। এটি লিঙ্গ পরিচয় এবং আদিবাসী পরিচয়ের পারস্পরিক সংযোগের (intersection) প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে, যা প্রায়শই সাঁওতাল নারীদের জন্য বহুগুণে বর্ধিত বঞ্চনার সৃষ্টি করে। অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এই সমস্যাগুলো সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা অপরিহার্য।

নীতিগত দৃষ্টিকোণ থেকে, এই গবেষণাটি সরকারি উদ্যোগ এবং কল্যাণমূলক কর্মসূচিগুলোর কার্যকারিতা সম্পর্কে মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে। এটি কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো এবং যেসব ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট ও লক্ষ্যভিত্তিক হস্তক্ষেপ প্রয়োজন, সেগুলোকে চিহ্নিত করতে সহায়তা করে। উদাহরণস্বরূপ, শিক্ষার ক্ষেত্রে সামগ্রিক উন্নতি সাধিত হওয়া সত্ত্বেও, পড়াশোনা মাঝপথে ছেড়ে দেওয়ার হার (dropout rates) এবং উচ্চশিক্ষার সুযোগের সীমাবদ্ধতার মতো সমস্যাগুলো এখনও বিদ্যমান; যা আরও সুনির্দিষ্ট ও লক্ষ্যভেদী নীতি প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তাকেই নির্দেশ করে।

অধিকন্তু, এই গবেষণাটি আর্থ-সামাজিক ক্ষমতায়নের অনুঘটক হিসেবে শিক্ষার ভূমিকার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। এটি স্পষ্টভাবে তুলে ধরে যে, শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা গেলে তা কীভাবে উন্নত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সামগ্রিক গোষ্ঠীগত উন্নয়নে সহায়ক হয়ে উঠতে পারে।

পরিশেষে বলা যায়, এই গবেষণাটি গবেষক, নীতিনির্ধারক এবং উন্নয়ন-কর্মীদের নিকট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; কারণ এটি সাঁওতাল নারীদের ক্রমবিকাশমান সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ ও সামগ্রিক ধারণা প্রদান করে এবং ভবিষ্যৎ গবেষণা ও নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে একটি মজবুত ভিত্তি স্থাপন করে।

6. সাঁওতাল নারীদের আর্থ-সামাজিক ও শিক্ষাগত অবস্থার বিবর্তন (Evolution of the Socio-Economic and Educational Status of Santal Women)-

“বর্ধমান ও হুগলি জেলায় সাঁওতাল নারীদের আর্থ-সামাজিক ও শিক্ষাগত অবস্থার ক্রমবিবর্তন (১৯৫১-২০১১)” শীর্ষক এই গবেষণাটি ছয় দশক ধরে সাঁওতাল নারীদের জীবনে ঘটে যাওয়া রূপান্তরকে পর্যালোচনা করে। এই গবেষণায় তুলে ধরা হয়েছে যে, স্বাধীনতার পরবর্তী প্রাথমিক পর্যায়ে

সাঁওতাল নারীরা কীভাবে তীব্র আর্থ-সামাজিক বঞ্চনা, শিক্ষার সীমিত সুযোগ এবং প্রথাগত জীবিকার ওপর প্রবল নির্ভরতার সম্মুখীন হয়েছিলেন। সময়ের পরিক্রমায় সরকারি নীতি, ভূমি সংস্কার, আদিবাসী কল্যাণমূলক কর্মসূচি এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রসারের ফলে তাঁদের অবস্থার ক্রমশ উন্নতি সাধিত হয়। সাঁওতাল নারীদের মধ্যে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পায়, যার ফলে তাঁদের সচেতনতা বাড়ে এবং তাঁরা কর্মসংস্থান ও গোষ্ঠীগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় অধিকতর অংশগ্রহণ করতে শুরু করেন। তবে উচ্চশিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে এখনো নানাবিধ বৈষম্য বিদ্যমান। এই গবেষণাটি একদিকে যেমন অর্জিত অগ্রগতির দিকটি তুলে ধরে, তেমনি চলমান চ্যালেঞ্জগুলোর প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করে; পাশাপাশি এই অঞ্চলগুলোতে সাঁওতাল নারীদের টেকসই উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতি ও সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেয়।

6.1. সাঁওতাল নারীদের ঐতিহাসিক আর্থ-সামাজিক অবস্থা (১৯৫১-১৯৭১) পর্যালোচনা করা -

এই উদ্দেশ্যটির লক্ষ্য হলো স্বাধীনতার পরবর্তী প্রাথমিক পর্যায়ে-বিশেষ করে ১৯৫১ থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যবর্তী সময়ে-সাঁওতাল নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান অন্বেষণ করা। এই সময়কালটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি উন্নয়নমূলক নীতি এবং আধুনিকায়ন প্রক্রিয়ার ব্যাপক বাস্তবায়নের পূর্ববর্তী উপজাতীয় সমাজের প্রথাগত কাঠামোর প্রতিফলন ঘটায়। এই সময়ে, সাঁওতাল নারীরা মূলত কৃষি, বনজ-ভিত্তিক কার্যক্রম এবং অনানুষ্ঠানিক শ্রম খাতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে পারিবারিক অর্থনীতি টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

সাঁওতাল নারীরা জীবনধারণ-নির্ভর কৃষিকাজে সক্রিয়ভাবে নিয়োজিত ছিলেন; এর অন্তর্ভুক্ত ছিল বীজ বপন, আগাছা নিড়ানি, ফসল কর্তন এবং ফসল প্রক্রিয়াজাতকরণের মতো কাজগুলো। তাঁদের অর্থনৈতিক অবদান যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও, আনুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক নথিপত্রে তা প্রায়শই অবমূল্যায়িত হতো এবং অনেকাংশেই অস্বীকৃত থেকে যেত। কৃষিকাজের পাশাপাশি, জ্বালানি, খাদ্য এবং বাড়তি আয়ের জন্য তাঁরা বনজ সম্পদের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল ছিলেন-যা প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে তাঁদের নিবিড় সম্পর্কের বিষয়টিকেই তুলে ধরে।

সামাজিকভাবে, অন্যান্য অনেক সম্প্রদায়ের নারীদের তুলনায় সাঁওতাল নারীরা অপেক্ষাকৃত অধিক স্বাধীনতার অধিকারী ছিলেন-বিশেষ করে চলাফেরার স্বাধীনতা এবং সাংস্কৃতিক আচার-অনুষ্ঠানে

অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে। তবে, দারিদ্র্য, শিক্ষার অভাব এবং স্বাস্থ্যসেবা ও আনুষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের মতো প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ-সুবিধায় সীমিত প্রবেশাধিকারের কারণে তাঁদের সামাজিক অবস্থান তখনও নানাবিধ সীমাবদ্ধতার দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল। নিরক্ষরতা ছিল ব্যাপক এবং শিক্ষার সুযোগ ছিল অত্যন্ত নগণ্য; যা তাঁদের আর্থ-সামাজিক গতিশীলতাকে আরও বেশি সংকুচিত করে তুলেছিল।

এই উদ্দেশ্যটি সাঁওতাল সম্প্রদায়ের অভ্যন্তরে শ্রমের লিঙ্গ-ভিত্তিক বিভাজনকেও পর্যালোচনা করে, যেখানে নারীদের উৎপাদনমূলক এবং প্রজননমূলক-উভয় প্রকার দায়িত্বেরই দ্বৈত বোঝা বহন করতে হতো। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে তাঁদের সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকা সত্ত্বেও, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা মূলত পরিবার ও সম্প্রদায়ের পুরুষ সদস্যদের হাতেই ন্যস্ত থাকত।

সামগ্রিকভাবে, এই উদ্দেশ্যটি সাঁওতাল নারীদের প্রথাগত আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে একটি প্রাথমিক বা ভিত্তিগত ধারণা প্রদান করে; যা পরবর্তী দশকগুলোতে সংঘটিত পরিবর্তনসমূহ এবং উন্নয়নের গতিধারা বিশ্লেষণের জন্য অপরিহার্য।

6.2. সময়ের সাথে সাথে শিক্ষাগত অবস্থার পরিবর্তন বিশ্লেষণ করা -

এই উদ্দেশ্যটি বিভিন্ন দশকে, বিশেষ করে ১৯৫১ থেকে ২০১১ সালের মধ্যবর্তী সময়ে, সাঁওতাল নারীদের শিক্ষাগত অবস্থার রূপান্তর বা পরিবর্তন পরীক্ষা করার ওপর আলোকপাত করে। শিক্ষাকে সামাজিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের একটি মূল সূচক হিসেবে বিবেচনা করা হয়; তাই সাক্ষরতা, বিদ্যালয়ে ভর্তি এবং উচ্চশিক্ষায় প্রবেশের সুযোগ সংক্রান্ত প্রবণতাগুলো বিশ্লেষণ করা অত্যন্ত জরুরি।

প্রাথমিক দশকগুলোতে দারিদ্র্য, সচেতনতার অভাব, সাংস্কৃতিক বাধা এবং উপজাতীয় এলাকাগুলোতে শিক্ষার অবকাঠামোগত অপ্রতুলতার মতো বিভিন্ন কারণে সাঁওতাল নারীদের সাক্ষরতার হার ছিল অত্যন্ত কম। পরিবারগুলো শিক্ষার চেয়ে অর্থনৈতিক টিকে থাকাকেই অধিক অগ্রাধিকার দিত বলে মেয়েদের শিক্ষার বিষয়টি প্রায়শই অবহেলিত হতো। বিদ্যালয়গুলোর সংখ্যা ছিল নগণ্য; আর যেখানে বিদ্যালয় ছিলও, সেখানেও দূরত্ব, ভাষার বাধা এবং নারী শিক্ষকের অভাবের মতো সমস্যাগুলো মেয়েদের শিক্ষায় অংশগ্রহণে নিরুৎসাহিত করত।

সময়ের পরিক্রমায় প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার, 'সর্ব শিক্ষা অভিযান' -এর মতো সরকারি উদ্যোগ এবং শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে বর্ধিত সচেতনতার ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিলক্ষিত হয়েছে। সাঁওতাল মেয়েদের বিদ্যালয়ে ভর্তির হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সাক্ষরতার স্তরেও একটি ধারাবাহিক ঊর্ধ্বগতি দেখা গেছে। তবে, বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ার হার-বিশেষ করে মাধ্যমিক ও উচ্চ

মাধ্যমিক স্তরে—এখনও একটি বড় উদ্বেগের বিষয় হয়েই আছে। অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা, বাল্যবিবাহ এবং পারিবারিক দায়িত্বের বোঝা প্রায়শই মেয়েদের শিক্ষাগ্রহণে ইতি টানতে বাধ্য করে।

সাঁওতাল নারীদের জন্য উচ্চশিক্ষায় প্রবেশের সুযোগ এখনও সীমিত, যদিও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এ ক্ষেত্রে কিছুটা অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। উপজাতীয় শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষাবৃত্তি, কোটা বা সংরক্ষণ নীতি এবং ছাত্রাবাসের প্রবর্তন শিক্ষায় তাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে; তবে আর্থিক বাধা এবং সঠিক নির্দেশনার অভাবের মতো চ্যালেঞ্জগুলো এখনও বিদ্যমান।

এই উদ্দেশ্যটি শিক্ষাগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে অর্জিত অগ্রগতি এবং বিদ্যমান ঘাটতি—উভয় বিষয়কেই তুলে ধরে। এর মাধ্যমে সাঁওতাল নারীদের জন্য শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাপূর্ণ সুযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট ও লক্ষ্যভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

6.3. উন্নয়ন নীতি ও কল্যাণমূলক কর্মসূচির প্রভাব মূল্যায়ন করা -

এই উদ্দেশ্যের লক্ষ্য হলো সাঁওতাল নারীদের আর্থ-সামাজিক ও শিক্ষাগত অবস্থার উন্নয়নে সরকারি নীতি এবং কল্যাণমূলক কর্মসূচির ভূমিকা মূল্যায়ন করা। স্বাধীনতার পর থেকে উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে; যার মধ্যে রয়েছে ভূমি সংস্কার, দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি এবং শিক্ষামূলক প্রকল্পসমূহ।

ভূমি সংস্কার নীতিসমূহ—বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে—সাঁওতালসহ অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। জমির অধিকার বা মালিকানা লাভের ফলে তাদের জীবিকা নির্বাহের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং শোষণমূলক শ্রম-ব্যবস্থার ওপর তাদের নির্ভরতা হ্রাস পেয়েছে। এছাড়া আবাসন, স্বাস্থ্যসেবা এবং কর্মসংস্থানের ওপর গুরুত্বারোপকারী উপজাতীয় কল্যাণমূলক প্রকল্পসমূহ তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নেও অবদান রেখেছে।

বিনামূল্যে ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা, মধ্যাহ্নভোজ কর্মসূচি এবং তফসিলি উপজাতিভুক্ত শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তির মতো শিক্ষানীতিগুলো সাঁওতাল মেয়েদের বিদ্যালয়ে ভর্তি এবং পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার (ধরে রাখার) হার বৃদ্ধিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। নারী ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি—

যেমন 'স্বনির্ভর গোষ্ঠী' (SHGs)—নারীদের আর্থিক স্বাধীনতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা বৃদ্ধিতেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

তবে, এই নীতিগুলোর কার্যকারিতা সবক্ষেত্রে সমান বা সুষম ছিল না। অনেক ক্ষেত্রেই যথাযথ বাস্তবায়নের অভাব, দুর্নীতি এবং সুবিধাভোগীদের মধ্যে সচেতনতার স্বল্পতার কারণে এসব নীতির প্রভাব অনেকটাই ম্লান হয়ে গেছে। উপজাতীয় এলাকাগুলোর দুর্গম অবস্থান, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধকতা এবং অপরিপূর্ণ অবকাঠামোর মতো কাঠামোগত বাধাগুলো নীতিমালার সুফল পূর্ণাঙ্গভাবে প্রাপ্তির পথে প্রতিনিয়ত অন্তরায় সৃষ্টি করে চলেছে।

এই উদ্দেশ্যটি উন্নয়নমূলক উদ্যোগগুলোর সাফল্য ও সীমাবদ্ধতা—উভয় বিষয়কেই সমালোচনামূলক দৃষ্টিতে পর্যালোচনা করে এবং নীতিগুলোকে কীভাবে আরও অধিকতর কার্যকর করে তোলা যায়, সে সম্পর্কে মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে। সাঁওতাল নারীরা যেন উন্নয়ন কর্মসূচিগুলোর পূর্ণাঙ্গ সুফল ভোগ করতে পারেন, তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এটি একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক, অংশগ্রহণমূলক এবং সাংস্কৃতিকভাবে সংবেদনশীল দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্বের ওপর বিশেষ জোর প্রদান করে।

6.4. সাঁওতাল নারীরা যেসব চ্যালেঞ্জ ও সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন হন, তা চিহ্নিত করা

-

এই উদ্দেশ্যটি মূলত সেই প্রধান চ্যালেঞ্জ এবং কাঠামোগত সীমাবদ্ধতাগুলো চিহ্নিত করার ওপর আলোকপাত করে, যা সাঁওতাল নারীদের আর্থ-সামাজিক ও শিক্ষাগত অগ্রগতির পথে ক্রমাগত বাধা সৃষ্টি করে চলেছে। বিগত বছরগুলোতে লক্ষণীয় অগ্রগতি সাধিত হওয়া সত্ত্বেও, নানাবিধ প্রতিবন্ধকতা এখনো উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় তাদের পূর্ণ অংশগ্রহণের সুযোগকে সীমিত করে রেখেছে।

দারিদ্র্য এখনো অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিদ্যমান, যা অনেক সাঁওতাল নারীকে স্বল্প-বেতনের ও অনানুষ্ঠানিক শ্রমকাজে নিয়োজিত হতে বাধ্য করে—যেসব কাজে চাকরির নিরাপত্তা অত্যন্ত নগণ্য। অর্থনৈতিক দুরাবস্থার কারণে প্রায়শই শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং যথাযথ পুষ্টির সুযোগ সীমিত হয়ে পড়ে, যা তাদের সামগ্রিক সুস্থ জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করে। নিজ সম্প্রদায়ের অভ্যন্তরে এবং বৃহত্তর সমাজের পরিসরে—উভয় ক্ষেত্রেই বিদ্যমান লিঙ্গবৈষম্য নারীদের জন্য সুযোগের ক্ষেত্রকে আরও সংকুচিত করে তোলে।

বাল্যবিবাহ আরেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা, যা সাঁওতাল মেয়েদের শিক্ষাগত ও ব্যক্তিগত বিকাশে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এর ফলে প্রায়শই মেয়েদের পড়াশোনা মাঝপথে থেমে যায় (স্কুল-ছুট হওয়া), অল্প বয়সেই সন্তান ধারণ করতে হয় এবং স্বাস্থ্যঝুঁকি বহুগুণ বেড়ে যায়। নিজেদের অধিকার,

সরকারি বিভিন্ন প্রকল্প এবং বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে সচেতনতার অভাবও তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

অধিকন্তু, মানসম্মত শিক্ষা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগের অপ্রতুলতা এখনো একটি বড় সীমাবদ্ধতা হিসেবে রয়ে গেছে। এমনকি নারীরা শিক্ষিত হয়ে উঠলেও, প্রয়োজনীয় দক্ষতার অভাব, বৈষম্য এবং পর্যাপ্ত সহায়তা ব্যবস্থার অভাবে আনুষ্ঠানিক কর্মসংস্থান লাভে তাদের প্রায়শই নানামুখী চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়।

পুষ্টিহীনতা এবং স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের সুযোগের অভাবসহ স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা তাদের নাজুক অবস্থাকে আরও প্রকট করে তোলে। তাছাড়া, উপজাতীয় এলাকাগুলোর ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা এবং দুর্বল অবকাঠামো উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অতিরিক্ত প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে।

এই উদ্দেশ্যটি উল্লিখিত চ্যালেঞ্জগুলোর পারস্পরিক আন্তঃসম্পর্কের ওপর গুরুত্বারোপ করে এবং এই সমস্যাগুলো কার্যকরভাবে মোকাবিলা করার লক্ষ্যে একটি সমন্বিত ও বহুমুখী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তাকে বিশেষভাবে তুলে ধরে।

6.5. আর্থ-সামাজিক রূপান্তরের সামগ্রিক ধারা মূল্যায়ন করা (১৯৫১-২০১১) -

এই উদ্দেশ্যের লক্ষ্য হলো ১৯৫১ থেকে ২০১১ সালের মধ্যবর্তী সময়ে সাঁওতাল নারীদের দীর্ঘমেয়াদী আর্থ-সামাজিক ও শিক্ষাগত রূপান্তরের একটি পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন প্রদান করা। একটি তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বনের মাধ্যমে, এই গবেষণাটি বিভিন্ন সময়কালে ঘটে যাওয়া পরিবর্তনসমূহ বিশ্লেষণ করে; যার উদ্দেশ্য হলো অর্জিত অগ্রগতির মাত্রা এবং বিদ্যমান বৈষম্যসমূহের স্থায়িত্ব বা ধারাবাহিকতা অনুধাবন করা।

গত ছয় দশক ধরে, সাক্ষরতা, কর্মসংস্থানের সুযোগ এবং মৌলিক পরিষেবা প্রাপ্তির মতো ক্ষেত্রগুলোতে উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিলক্ষিত হয়েছে। শিক্ষার প্রসার এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচির বাস্তবায়নের ফলে নারীদের ক্রমান্বয়ে ক্ষমতায়ন ঘটেছে এবং তাদের জীবনযাত্রার মানের উন্নতি হয়েছে। নারীরা এখন তাদের অধিকার সম্পর্কে অধিকতর সচেতন এবং তারা অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে ক্রমবর্ধমান হারে অংশগ্রহণ করছে।

তবে, এই রূপান্তরের ধারাটি ছিল অসম এবং তা আঞ্চলিক ও সামাজিক বৈষম্য দ্বারা চিহ্নিত। যেখানে সাঁওতাল নারীদের কোনো কোনো অংশ উন্নয়নমূলক উদ্যোগগুলো থেকে উপকৃত হয়েছে, সেখানে দারিদ্র্য, সুযোগ-সুবিধার অভাব এবং আর্থ-সাংস্কৃতিক সীমাবদ্ধতার মতো বিভিন্ন কারণে অন্য

অংশগুলো এখনো প্রান্তিক অবস্থানেই রয়ে গেছে। আধুনিকায়ন ও শিল্পায়নের সুফলগুলো সবার মাঝে সমানভাবে বণ্টিত হয়নি।

এই উদ্দেশ্যটি নারীদের প্রথাগত জীবিকা থেকে সরে এসে অধিকতর বৈচিত্র্যময় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে-যার মধ্যে মজুরিভিত্তিক শ্রম এবং স্ব-সহায়ক দলগুলোতে অংশগ্রহণ অন্তর্ভুক্ত-যুক্ত হওয়ার প্রবণতাটিও পরীক্ষা করে দেখে। একই সাথে, এটি অনানুষ্ঠানিক কর্মসংস্থান এবং অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার ধারাবাহিক উপস্থিতির বিষয়টিকেও বিশেষভাবে তুলে ধরে।

বিভিন্ন দশকের পরিস্থিতির তুলনা করার মাধ্যমে, এই গবেষণাটি ইতিবাচক প্রবণতা এবং অগ্রগতির স্থবির ক্ষেত্র-উভয়কেই চিহ্নিত করে। এটি জোরালোভাবে উল্লেখ করে যে, যদিও কিছুটা অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, তবুও তা পূর্ণাঙ্গ আর্থ-সামাজিক সমতা নিশ্চিত করার জন্য না-ই একরূপ (সবার ক্ষেত্রে সমান) এবং না-ই যথেষ্ট।

সামগ্রিকভাবে, এই উদ্দেশ্যটি সাঁওতাল নারীদের উন্নয়নের গতিপথ সম্পর্কে একটি সামগ্রিক ও পূর্ণাঙ্গ ধারণা প্রদান করে; যা ভবিষ্যৎ নীতি প্রণয়ন এবং গবেষণার ক্ষেত্রে অত্যন্ত মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি বা দিকনির্দেশনা প্রদান করে।

7. পশ্চিমবঙ্গের সাঁওতাল উপজাতি

ভারতের আদমশুমারির (১৯৫১-২০১১) মাধ্যমিক তথ্যের ভিত্তিতে-বিশেষ করে 'ডিস্ট্রিক্ট সেন্সাস হ্যান্ডবুক' (DCHB) এবং 'প্রাইমারি সেন্সাস অ্যাবস্ট্রাক্ট'-এর ওপর নির্ভর করে-তৈরি এই প্রতিবেদনে তফসিলি উপজাতি (ST) জনসংখ্যা, শিক্ষার হার এবং নির্বাচিত আর্থ-সামাজিক সূচক সম্পর্কিত জেলা-ভিত্তিক তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে, সাঁওতালরাই হলো বৃহত্তম তফসিলি উপজাতি গোষ্ঠী; রাজ্যের মোট উপজাতি জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি অংশ জুড়ে রয়েছে তারাই। তাই, সাঁওতাল নারীদের বর্তমান অবস্থা বোঝার জন্য রাজ্যের সামগ্রিক তফসিলি উপজাতি সংক্রান্ত প্রবণতাগুলোকে একটি নির্ভরযোগ্য নির্দেশক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে-বিশেষ করে সেই জেলাগুলোতে, যেখানে উপজাতি জনসংখ্যার মধ্যে সাঁওতালদের অংশই সর্বাধিক। আদমশুমারির তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও ধারাবাহিকতা থাকা সত্ত্বেও, এর কিছু সীমাবদ্ধতা অবশ্যই স্বীকার করে নেওয়া প্রয়োজন। শিক্ষার সংজ্ঞায় পরিবর্তনের কারণে বিভিন্ন দশকের তথ্যের মধ্যে তুলনা করা কিছুটা কঠিন হয়ে পড়ে: ১৯৮১ সালের আগে শিক্ষার হার পরিমাপ করা হতো ৫ বছর বা তার বেশি বয়সী জনসংখ্যার ক্ষেত্রে; অথচ ১৯৮১ সাল থেকে এই মাপকাঠিটি ৭ বছর বা তার বেশি বয়সী জনসংখ্যার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। এছাড়া,

১৯৫১ সালের আদমশুমারিতে তফসিলি উপজাতি-কেন্দ্রিক এবং লিঙ্গ-ভিত্তিক পৃথক তথ্যের পরিমাণ অত্যন্ত সীমিত ছিল, যার ফলে সেই সময়ের প্রাথমিক বা ভিত্তি-স্তরের মূল্যায়নগুলো কিছুটা দুর্বল থেকে যায়। অন্যান্য চ্যালেঞ্জগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রত্যন্ত উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে জনসংখ্যার সঠিক হিসাব না আসা বা 'আন্ডার-রিপোর্টিং'-এর সম্ভাবনা এবং সময়ের সাথে সাথে তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতিতে আসা বিভিন্ন পরিবর্তন। তা সত্ত্বেও, উপজাতি সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী আর্থ-সামাজিক ও শিক্ষাগত প্রবণতাগুলো পর্যালোচনার ক্ষেত্রে আদমশুমারি আজও একটি অপরিহার্য ও প্রামাণ্য উৎস হিসেবেই বিবেচিত হয়।

7.1. বর্ধমান ও হুগলি: তফসিলি উপজাতি সংক্রান্ত প্রবণতা এবং সাঁওতালদের বিশেষ চিত্র

বর্ধমান ও হুগলি জেলায় তফসিলি উপজাতি (ST) জনসংখ্যা গত কয়েক দশক ধরে ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে; এই বৃদ্ধি একদিকে যেমন জনসংখ্যার স্বাভাবিক প্রবৃদ্ধিকে নির্দেশ করে, তেমনি তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতির উন্নতির বিষয়টিও প্রতিফলিত করে। উদাহরণস্বরূপ, বর্ধমান জেলায় তফসিলি উপজাতি জনসংখ্যা ১৯৬১ সালের প্রায় ১,৮০,০০০ থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১১ সালে ৪,৮৯,৪৪৭-এ উন্নীত হয়েছে। জনসংখ্যার এই ব্যাপক বৃদ্ধি উপজাতি সম্প্রদায়গুলোর-যার অন্তর্ভুক্ত সাঁওতালরাও-আর্থ-সামাজিক ও শিক্ষাগত সূচকগুলোতে আসা পরিবর্তনগুলো বোঝার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষাপট তৈরি করে দেয়। শিক্ষার হারের বিচারে, ২০১১ সালের আদমশুমারির তথ্য অনুযায়ী বর্ধমান জেলায় তফসিলি উপজাতিভুক্ত নারীদের শিক্ষার হার গ্রামীণ এলাকায় ছিল প্রায় ৪৩.৮% এবং শহরাঞ্চলে ছিল ৪৫.৭%। এই পরিসংখ্যানগুলো পশ্চিমবঙ্গের সামগ্রিক সাঁওতাল নারী শিক্ষার হার ৪৩.৫১%-এর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ; যা নির্দেশ করে যে, জেলা-পর্যায়ের প্রবণতাগুলো মূলত নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর নিজস্ব ধারারই প্রতিফলন।

তবে, দীর্ঘমেয়াদী পরিবর্তনগুলো বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে একটি প্রধান সীমাবদ্ধতা হলো-সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত আদমশুমারি তথ্যে, বিশেষত সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর জন্য জেলা-পর্যায়ের কোনো ধারাবাহিক 'সময়-ভিত্তিক উপাত্ত' (time series) বা তথ্যের অনুপস্থিতি। অধিকাংশ আদমশুমারি সারণিতেই তথ্যগুলোকে বৃহত্তর 'তপশিলি উপজাতি' (ST) বর্গের অধীনে একত্রিত করা হয়; ফলে জেলা-পর্যায়ে সময়ের সাথে সাথে কেবল সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর নির্দিষ্ট অগ্রগতিটুকু আলাদা করে চিহ্নিত করা কঠিন হয়ে পড়ে। তা সত্ত্বেও, ২০১১ সালের পশ্চিমবঙ্গের একটি চিত্র থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু অন্তর্দৃষ্টি পাওয়া যায়: ওই বছর সাঁওতাল নারীদের শিক্ষার হার রেকর্ড করা হয়েছিল ৪৩.৫১%, যা সামগ্রিক তপশিলি উপজাতি (ST) নারীদের শিক্ষার হার ৪৭.৭১%-এর তুলনায় সামান্য কম। একই সময়ে, সাঁওতাল

নারীদের 'কাজে অংশগ্রহণের হার' (WPR) ছিল লক্ষণীয়ভাবে উচ্চ-৪৪.০০%; যা এই রাজ্যের বিভিন্ন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে অন্যতম সর্বোচ্চ হার হিসেবে পরিগণিত হয়। এটি নির্দেশ করে যে, যদিও সাঁওতাল নারীদের শিক্ষাগত অর্জন সামগ্রিক তপশিলি উপজাতি বর্গের গড় হারের তুলনায় কিছুটা পিছিয়ে থাকতে পারে, তবুও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে তাদের অংশগ্রহণ অত্যন্ত শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে-যা তাদের একটি স্বতন্ত্র আর্থ-সামাজিক পরিচিতিতে তুলে ধরে।

শিক্ষাগত অবস্থা: ধীরগতিসম্পন্ন হলেও ক্রমশ ত্বরান্বিত উন্নতি: পশ্চিমবঙ্গে তপশিলি উপজাতি (ST) নারীদের শিক্ষার হার (যা সাঁওতাল নারীদের শিক্ষার হারের একটি শক্তিশালী নির্দেশক হিসেবে কাজ করে) একটি সুস্পষ্ট উর্ধ্বমুখী বিবর্তন বা অগ্রগতির ধারা প্রদর্শন করে

জনগণনা অনুযায়ী নারী সাক্ষরতার প্রবণতা

জনগণনা বছর	এসটি (ST) নারী সাক্ষরতা (%)	পশ্চিমবঙ্গের মোট নারী সাক্ষরতা (%)	লিঙ্গ বৈষম্য (ST)	মন্তব্য
1961	1.76	20.27	অত্যন্ত বেশি	অত্যন্ত নিম্ন ভিত্তি
1971	3.09	22.08	বেশি	ধীর সূচনা
1981	5.01	30.25	বেশি	এখনও প্রান্তিক অবস্থা
1991	14.98	46.6	বেশি	১৯৮০-এর পর দ্রুত অগ্রগতি শুরু
2001	29.2	59.6	প্রায় ২৮ পয়েন্ট	দ্রুত বৃদ্ধি
2011	47.71	70.54	প্রায় ২০ পয়েন্ট	প্রায় ৫০% অর্জন; ব্যবধান কমছে

বিশ্লেষণ: ১৯৬১ থেকে ২০১১-এই পাঁচ দশক জুড়ে সাঁওতাল নারীদের মধ্যে সাক্ষরতার ক্ষেত্রে এক অসাধারণ রূপান্তর পরিলক্ষিত হয়েছে। ১৯৬১ সালে যেখানে সাক্ষরতার হার ছিল প্রায় শূন্যের কোঠায় (২%-এর নিচে), সেখানে ২০১১ সালের মধ্যে সাঁওতাল নারীদের প্রায় অর্ধেকই সাক্ষর হয়ে ওঠেন-যা সাক্ষরতার হারে প্রায় ২৭ গুণ বৃদ্ধির ইঙ্গিত দেয়। তবে, বিভিন্ন সময়কালে এই অগ্রগতির গতি ছিল অসম। ১৯৬১ থেকে ১৯৮১ সালের মধ্যবর্তী পর্যায়টি ছিল ধীরগতির উন্নতির কাল; এর প্রধান কারণ ছিল ঔপনিবেশিক শাসন এবং স্বাধীনতার পরবর্তী প্রাথমিক বছরগুলোতে শিক্ষার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক

অবহেলা। এর পাশাপাশি ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা, দারিদ্র্য এবং উপজাতীয় অঞ্চলগুলোতে শিক্ষাগত অবকাঠামোর সীমিত প্রাপ্যতাও এই ধীরগতির জন্য দায়ী ছিল। ১৯৯১ সালের পর সাক্ষরতার প্রসারে এক উল্লেখযোগ্য গতি সঞ্চারিত হয়। এর পেছনে মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছে সুনির্দিষ্ট নীতিগত পদক্ষেপসমূহ—যেমন 'সর্ব শিক্ষা অভিযান', 'উপজাতি উপ-পরিকল্পনা' (Tribal Sub-Plans), শিক্ষাবৃত্তি প্রদান এবং মেয়েদের জন্য ছাত্রাবাস স্থাপন; এই পদক্ষেপগুলো শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি এবং শিক্ষার্থীদের শিক্ষাঙ্গনে ধরে রাখার ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছে।

এই অগ্রগতি সত্ত্বেও, সাঁওতাল নারীরা সামগ্রিক 'তপশিলি উপজাতি' (ST) নারী জনগোষ্ঠীর তুলনায় এখনো কিছুটা পিছিয়ে রয়েছেন। ২০১১ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, যেখানে সামগ্রিক তপশিলি উপজাতি নারীদের সাক্ষরতার হার ছিল ৪৭.৭১%, সেখানে সাঁওতাল নারীদের ক্ষেত্রে এই হার ছিল ৪৩.৫১%। তথাপি, এই জনগোষ্ঠী সাক্ষরতার প্রসারে প্রতি দশকে শক্তিশালী প্রবৃদ্ধির স্বাক্ষর রেখেছে; বিশেষ করে ২০০১ থেকে ২০১১ সালের মধ্যবর্তী সময়ে সাঁওতাল নারীদের সাক্ষরতার হার ৬১.২৭% বৃদ্ধি পেয়েছে। জেলা পর্যায়ে, বর্ধমান ও হুগলির মতো এলাকাগুলোতে অনুরূপ প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়; যেখানে গ্রামীণ তফসিলি উপজাতি (ST) নারীদের সাক্ষরতার হার (২০১১ সালে যা ছিল প্রায় ৪৩-৪৫%) রাজ্যের সামগ্রিক সাঁওতাল নারী সাক্ষরতার হারের সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ—যা এই অঞ্চলগুলোর তুলনীয় আর্থ-সামাজিক ও শিক্ষাগত অবস্থারই ইঙ্গিত বহন করে।

৪. সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থান (উপলব্ধ সূচকসমূহ)

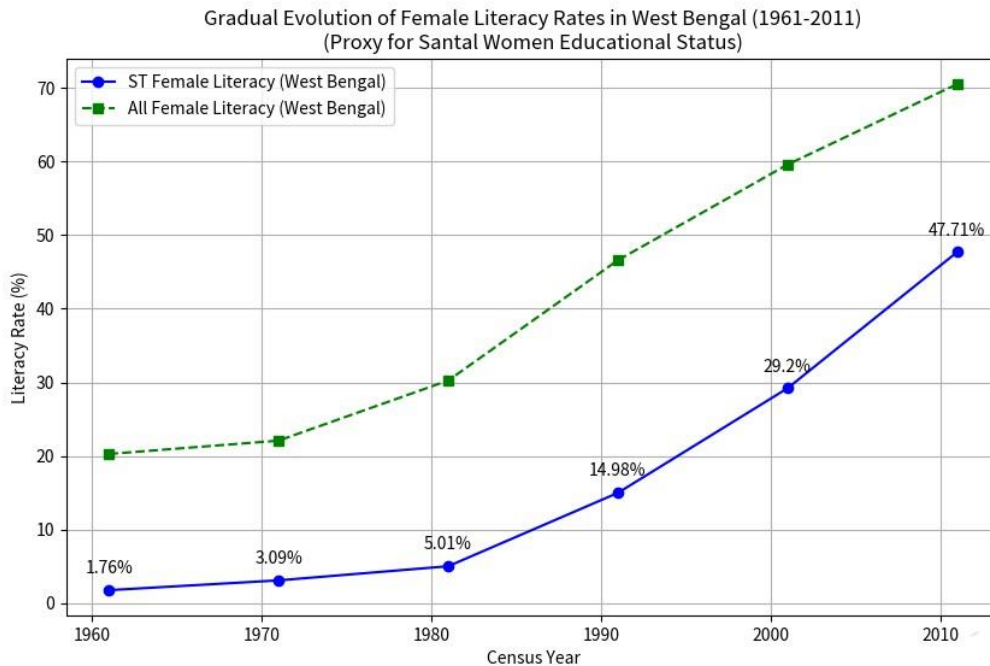
পশ্চিমবঙ্গের সাঁওতাল নারীরা একটি স্বতন্ত্র সামাজিক-অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী; যার মূল দিক হলো শ্রমশক্তিতে তাঁদের উচ্চমাত্রার অংশগ্রহণ—পাশাপাশি বিদ্যমান কিছু কাঠামোগত চ্যালেঞ্জ। ২০১১ সালে, তাঁদের 'শ্রম অংশগ্রহণের হার' (WPR) ছিল প্রায় ৪৪%, যা রাজ্যের অন্যান্য আদিবাসী সম্প্রদায়ের তুলনায় অন্যতম সর্বোচ্চ। এই উচ্চমাত্রার অংশগ্রহণ মূলত কৃষি-শ্রম ও চাষাবাদের মতো ঐতিহ্যবাহী পেশাগুলোর মধ্যেই কেন্দ্রীভূত, যা গ্রামীণ আদিবাসী সমাজের দীর্ঘদিনের অর্থনৈতিক ভূমিকারই প্রতিফলন। একই সাথে, সাঁওতালদের মধ্যে লিঙ্গানুপাত বেশ অনুকূল; গ্রামীণ এলাকায় প্রতি ১০০০ পুরুষের বিপরীতে নারীর সংখ্যা ১০১৩ এবং শহরাঞ্চলে ১০০৪—যা অন্যান্য অনেক সম্প্রদায়ের তুলনায় অপেক্ষাকৃত ভারসাম্যপূর্ণ লিঙ্গ-জনমিতির ইঙ্গিত বহন করে।

তবে, শ্রমশক্তিতে জোরালো অংশগ্রহণ থাকা সত্ত্বেও, বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা তাঁদের সামগ্রিক সামাজিক-অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথকে সংকুচিত করে রেখেছে। নির্দিষ্ট কিছু আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে অপেক্ষাকৃত উচ্চ জন্মহার, জমি থেকে উচ্ছেদ বা জমির মালিকানা হারানো, জীবিকার সন্ধানে

ঋতুভিত্তিক অভিবাসন এবং স্বল্প-মজুরির অনানুষ্ঠানিক কাজের ওপর নির্ভরতা-এমন সব বিষয় তাঁদের টেকসই অর্থনৈতিক উন্নতির সুযোগগুলোকে সীমিত করে তোলে। ফলস্বরূপ, সময়ের সাথে সাথে শিক্ষার হার বা স্তরের ক্রমশ উন্নতি ঘটলেও, সেই অগ্রগতি পূর্ণাঙ্গ ও অর্থবহ 'অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন'-এ রূপান্তরিত হতে পারেনি। সাঁওতাল নারীদের একটি বিশাল অংশ এখনো মূলত স্বল্প-দক্ষতাসম্পন্ন ও প্রাথমিক খাতের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডেই নিয়োজিত রয়েছেন; যা শিক্ষার প্রসার এবং কর্মসংস্থানের গুণগত মানের উন্নতির মধ্যকার ব্যবধানকেই স্পষ্টভাবে তুলে ধরে।

8.1. লেখচিত্র: নারী শিক্ষার ক্রমবিকাশ

নিচে একটি 'রেখাচিত্র' (Line Graph) উপস্থাপন করা হলো, যেখানে তফসিলি উপজাতি (ST) নারীদের শিক্ষার হার (যা এখানে সাঁওতাল নারীদের শিক্ষার হারের প্রতিনিধি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে) এবং সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের নারীদের শিক্ষার হারের মধ্যে একটি তুলনামূলক চিত্র দেখানো হয়েছে। এই লেখচিত্রে 'ST' বা আদিবাসী নারীদের শিক্ষার হার-সংক্রান্ত রেখাটি তাঁদের শিক্ষার ক্ষেত্রে এক অভাবনীয় ও দ্রুত অগ্রগতির চিত্র তুলে ধরেছে-বিশেষ করে ১৯৯১ সালের পরবর্তী সময়ে।



8.2. ক্রমবিকাশের সারসংক্ষেপ (১৯৫১-২০১১)

- ১৯৫০-এর দশক থেকে ১৯৭০-এর দশক: শিক্ষার সুযোগ ছিল প্রায় অনুপস্থিত; সাঁওতাল নারীরা মূলত জীবনধারণ-নির্ভর কৃষি বা বনজ কাজে নিয়োজিত ছিলেন এবং তাঁদের আর্থ-সামাজিক গতিশীলতা ছিল অত্যন্ত সীমিত।
- ১৯৮০-এর দশক থেকে ১৯৯০-এর দশক: প্রাথমিক নীতিগত পদক্ষেপগুলোর সুফল দৃশ্যমান হতে শুরু করে; ১৯৯০-এর দশকে সাক্ষরতার হার দ্বিগুণ হয়।
- ২০০০-এর দশক থেকে ২০১১: সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যভিত্তিক প্রকল্পগুলোর কারণে অগ্রগতির গতি ত্বরান্বিত হয়; সাক্ষরতার হার ৫০%-এর কাছাকাছি পৌঁছায় এবং কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণের হার উচ্চ পর্যায়েই বজায় থাকে, তবে লিঙ্গবৈষম্য ও কাঠামোগত অসমতাগুলো依然 বিদ্যমান থাকে।
- বর্ধমান ও হুগলি জেলা-যেখানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক তফসিলি উপজাতি (ST) জনগোষ্ঠীর বসবাস রয়েছে-সেখানে পরিস্থিতি রাজ্যের সামগ্রিক ST/সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর প্রবণতাকেই নিবিড়ভাবে অনুসরণ করে; এই জেলাগুলোতে ২০১১ সালের সাক্ষরতার হারও রাজ্যের গড় হারের সাথে তুলনীয়।

৭. বর্ধমান ও হুগলি জেলায় সাঁওতাল নারীদের আর্থ-সামাজিক ও শিক্ষাগত অবস্থার বিবর্তন

পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান ও হুগলি জেলার সাঁওতাল নারীদের আর্থ-সামাজিক ও শিক্ষাগত অবস্থার ক্ষেত্রে ১৯৫১ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে ক্রমশ উন্নতি পরিলক্ষিত হয়েছে। সরকারি নীতি, নগরায়ন এবং শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধির ফলেই এই অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে; যদিও দারিদ্র্য ও লিঙ্গবৈষম্যের মতো চ্যালেঞ্জগুলো তখনও বিদ্যমান ছিল। সাঁওতালরা হলো একটি অন্যতম প্রধান 'তপশিলি উপজাতি' (ST) গোষ্ঠী; ঐতিহাসিকভাবে তারা কৃষি ও গৃহস্থালি কাজের মতো প্রথাগত ভূমিকা পালন করে আসছিল। তবে আদমশুমারি সংক্রান্ত তথ্য এবং বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে, বিগত কয়েক দশক ধরে তাদের মধ্যে শিক্ষার হার এবং কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণের হার ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট (১৯৫১-১৯৭১): স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে, এই জেলাগুলোর সাঁওতাল নারীরা মূলত গ্রামাঞ্চলেই বসবাস করত। তারা গৃহস্থালি সামলানোর পাশাপাশি কৃষি শ্রমিক হিসেবে কৃষিকাজেও অবদান রাখত। তবে প্রায়শই তাদের পিতৃতান্ত্রিক সামাজিক রীতিনীতির অধীনে থাকতে হতো, যা তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাকে সীমিত করে রাখত। ১৯৫১ সালের দিকে পশ্চিমবঙ্গে তপশিলি উপজাতিভুক্ত নারীদের মধ্যে শিক্ষার হার ছিল অত্যন্ত কম। সেই সময়ে রাজ্যজুড়ে সামগ্রিক শিক্ষার হার ছিল প্রায় ২৫ শতাংশ, কিন্তু স্কুল বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক বাধার কারণে উপজাতিভুক্ত নারীদের ক্ষেত্রে শিক্ষার হার ছিল আরও অনেক কম। ১৯৭১ সালের মধ্যে,

উপজাতি উন্নয়ন কর্মসূচির মতো বিভিন্ন উদ্যোগের ফলে শিক্ষার ক্ষেত্রে কিছুটা ইতিবাচক অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়। তবে নারীদের কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণের হার তখনও মূলত কায়িক শ্রম বা শারীরিক পরিশ্রমনির্ভর কাজগুলোতেই (যেমন-কৃষিকাজ) সীমাবদ্ধ ছিল; যা তাদের ক্ষমতায়নের চেয়ে বরং অর্থনৈতিক বাধ্যবাধকতাকেই বেশি প্রতিফলিত করত।

আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনসমূহ (১৯৭১-১৯৯১): অর্থনৈতিক পরিবর্তনের অংশ হিসেবে সাঁওতালরা বর্ধমান (যা কয়লা ও শিল্পের জন্য বিখ্যাত) এবং হুগলির (বস্ত্রশিল্প ও বন্দরের জন্য পরিচিত) মতো নগরায়ন হতে থাকা এলাকাগুলোতে পাড়ি জমাতে শুরু করে। সেখানে সাঁওতাল নারীরা অসংগঠিত খাতের বিভিন্ন কাজে-যেমন দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে শ্রমিকে-নিযুক্ত হতে থাকে। এর ফলে তাদের পারিবারিক আয় বৃদ্ধি পেলেও, কাজের কঠোরতা বা ধকলও বহুগুণ বেড়ে যায়। গ্রামাঞ্চলে বসবাসরত সাঁওতালদের মধ্যে দারিদ্র্যের হার তখনও বেশ উঁচুই ছিল। অপুষ্টি, ঘন ঘন গর্ভধারণ এবং দীর্ঘ সময় ধরে (মাঠে প্রতিদিন ৭ ঘণ্টারও বেশি সময়) কাজ করার ফলে সাঁওতাল নারীরা অপুষ্টিজনিত সমস্যা এবং 'লুকানো ক্ষুধার' (hidden hunger) শিকার হতো। নারী ও পুরুষের শিক্ষার হারের ব্যবধান এই সময়ে কিছুটা কমে আসে। ১৯৬০-এর দশকে পশ্চিমবঙ্গের অনুরূপ জেলাগুলোতে তফসিলি উপজাতিভুক্ত নারীদের শিক্ষার হার যেখানে ১০ শতাংশেরও কম ছিল, সেখানে ১৯৯১ সালের মধ্যে তা বেড়ে প্রায় ২০ থেকে ৩০ শতাংশে উন্নীত হয়; আর এই অগ্রগতির পেছনে প্রাথমিক পর্যায়ের বিভিন্ন 'ইতিবাচক নীতি' বা 'affirmative policies'-এর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগতি (১৯৯১-২০১১)

২০১১ সালের মধ্যে সাক্ষরতার হারে উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিলক্ষিত হয়: বর্ধমান জেলায় সামগ্রিক নারী সাক্ষরতার হার বেড়ে ৬৯.৬৩ শতাংশে পৌঁছায় (যা ২০০১ সালে ছিল ৬০.৯৫ শতাংশ), এবং গ্রামীণ তফসিলি উপজাতি (ST) অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে এই হার ছিল ৬৫.৮৬ শতাংশ। হুগলি জেলাতেও অনুরূপ প্রবণতা দেখা যায়, যেখানে উপজাতি-অধ্যুষিত পকেট বা নির্দিষ্ট এলাকাগুলোতে তফসিলি উপজাতি নারীদের সাক্ষরতার হার ছিল প্রায় ৪৩ থেকে ৬৩ শতাংশ। 'সর্ব শিক্ষা অভিযান' এবং 'মধ্যাহ্ন ভোজন' কর্মসূচির মতো উদ্যোগগুলো তফসিলি উপজাতি শিক্ষার্থীদের-বিশেষ করে ছাত্রীদের-স্কুলে ভর্তির হার বৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা রাখে; এর ফলে পশ্চিমবঙ্গের কোনো কোনো নির্দিষ্ট এলাকায় সাঁওতাল নারীদের সাক্ষরতার হার ঐতিহাসিকভাবে ৮.৮ শতাংশ থেকে বেড়ে ৬৩ শতাংশে উন্নীত হয়। তবে, শিক্ষাক্ষেত্রে লিঙ্গবৈষম্য পুরোপুরি দূর হয়নি-পারিবারিক কাজকর্মের চাপে শিক্ষার্থীরা মাঝপথেই পড়াশোনা ছেড়ে দেওয়ায় তফসিলি উপজাতি পুরুষদের সাক্ষরতার হার প্রায়শই নারীদের তুলনায় ১৫ থেকে ২০ শতাংশ বেশি ছিল।

জেলা ও বিষয়ভিত্তিক নারী সাক্ষরতার পরিবর্তন

জেলা/দিক	১৯৫১ সাক্ষরতা (আনুমানিক ST নারী)	২০০১ সাক্ষরতা (নারী)	২০১১ সাক্ষরতা (ST নারী আনুমানিক)	প্রধান কারণ
বর্ধমান (Bardhaman)	<10%	60.95%	65-70%	শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান ও বিদ্যালয়ের বিস্তার
হুগলি (Hooghly)	<10%	~60%	60-63%	নগর এলাকার নিকটবর্তীতা
পশ্চিমবঙ্গের ST নারী	8-12%	43%	63% (নির্বাচিত এলাকা)	সরকারি প্রকল্প ও শিক্ষানীতি

কর্মশক্তির বিবর্তন: সাঁওতাল নারীদের কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণের হার (WPR) ধারাবাহিকভাবে শহুরে গড়ের চেয়ে বেশি ছিল; ১৯৮০-এর দশকে কৃষিক্ষেত্রে এই হার সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছালেও, পরবর্তীকালে কৃষিকাজে যন্ত্রের ব্যবহার বৃদ্ধির ফলে তা হ্রাস পায়। বর্ধমান ও হুগলি জেলায়, দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী তফসিলি জনজাতিভুক্ত (ST) নারীদের শ্রমক্ষেত্রে অংশগ্রহণের হার ২৭-৩৪ শতাংশে পৌঁছেছিল-যার অধিকাংশই ছিল পরিবারের অবৈতনিক সহায়ক হিসেবে। তবে, অভিবাসনের মাধ্যমে অর্জিত নগদ আয়ের ফলে ২০১১ সালের মধ্যে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটে। শহরায়ন-প্রভাবিত অন্যান্য জেলার তুলনায় এই জেলাগুলোতে কৃষিক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণের হার ছিল অনেক বেশি; যা মূলত জীবনধারণ-নির্ভর শ্রম থেকে ক্রমশ আধা-দক্ষ পেশার দিকে সরে আসার একটি ইঙ্গিত বহন করে।

সম্মুখীন চ্যালেঞ্জসমূহ: প্রগতি সত্ত্বেও, সাঁওতাল নারীদের শোষণ, নিরক্ষরতা-জনিত দারিদ্র্য এবং নানা ধরনের সাংস্কৃতিক কুসংস্কারের শিকার হতে হয়েছে। স্বাস্থ্যগত সমস্যা এবং সাংগঠনিক দুর্বলতার কারণে কর্মক্ষেত্রে তাদের উৎপাদনশীলতার ব্যবধান (পুরুষদের তুলনায়) ছিল বেশ প্রকট। প্রত্যন্ত গ্রামগুলোতে অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার কারণে শিক্ষার সুযোগ ছিল সীমিত, যা মেয়েদের অল্প বয়সেই শ্রমে নিয়োজিত হতে বাধ্য করত; অন্যদিকে, শহরাঞ্চলে অভিবাসী নারীদের মধ্যেও পুষ্টিহীনতার সমস্যা অব্যাহত ছিল। প্রচলিত লিঙ্গ-ভিত্তিক সামাজিক রীতিনীতি অনুযায়ী নারীদের আয়কে কেবল 'অতিরিক্ত' বা সহায়ক হিসেবে গণ্য করা হতো, যা তাদের নিজস্ব স্বকীয়তা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাকে সীমিত করে রেখেছিল।

মূল প্রভাবক ও ফলাফলসমূহ: সরকারি হস্তক্ষেপ (যেমন-দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি ও শিক্ষা প্রসারের উদ্যোগ) এবং শহরায়নের ফলে এই অবস্থার পরিবর্তনে গতি সঞ্চারিত হয়; যার ফলস্বরূপ ২০১১ সালের মধ্যে তফসিলি জনজাতিভুক্ত নারীদের মধ্যে শিক্ষার হারের দশক-ভিত্তিক বৃদ্ধি বেশ সন্তোষজনক পর্যায়ে পৌঁছায়। ২০১১ সালের মধ্যে বর্ধমান (জনসংখ্যা প্রায় ৭৭ লক্ষ; পরবর্তীতে বিভক্ত) এবং হুগলি (৫৫ লক্ষ) জেলায় সাঁওতাল নারীদের স্বাস্থ্য পরিস্থিতির উন্নতি ঘটে, বাল্যবিবাহের হার হ্রাস পায় এবং তারা পরিবারের অভ্যন্তরীণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সীমিত হলেও কিছু ভূমিকা পালন করতে শুরু করে। সামগ্রিকভাবে বলা যায়, ১৯৫১ সালের চরম দুর্দশাপূর্ণ পরিস্থিতি থেকে ২০১১ সালের আপেক্ষিক অর্জন পর্যন্ত-এই বিবর্তনের গতি ছিল ধীর ও অসম, তবুও নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে তা ছিল এক আমূল পরিবর্তনস্বরূপ।

10. বর্ধমান বনাম হুগলি জেলায় সাঁওতাল নারীদের সাক্ষরতার তুলনা: ১৯৫১-২০১১

বর্ধমান ও হুগলি জেলায় সাঁওতাল নারীদের সাক্ষরতার হার ১৯৫১ সালের প্রায় শূন্য স্তর থেকে ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে ২০১১ সালের মধ্যে একটি মাঝারি পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। তবে বর্ধমান জেলা তার শক্তিশালী শিল্পভিত্তি এবং বৃহত্তর সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর উপস্থিতির কারণে সাক্ষরতার ক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে হুগলি জেলার চেয়ে এগিয়ে ছিল। উভয় জেলাই পশ্চিমবঙ্গের তফসিলি উপজাতি (ST) নারীদের সাক্ষরতা সংক্রান্ত সামগ্রিক প্রবণতাকে প্রতিফলিত করেছে-যা ১৯৬১ সালে প্রায় ১.৭৬% থেকে শুরু হয়েছিল-তবে বর্ধমানের খনি-নির্ভর অর্থনীতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দ্রুততর প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

দশক-ভিত্তিক প্রবণতা: ১৯৫১-১৯৬১ সালের সময়কালে, উভয় জেলাতেই সাঁওতাল নারীদের সাক্ষরতার হার ২% থেকে ৫%-এর নিচে ছিল; গ্রামীণ বিচ্ছিন্নতা এবং ছেলেদের শিক্ষার প্রতি অধিক গুরুত্ব প্রদানের মতো সাংস্কৃতিক অগ্রাধিকারগুলোই এই স্বল্প হারের প্রধান কারণ ছিল। ১৯৭১-১৯৮১ সালের মধ্যে, 'উপজাতি উপ-পরিকল্পনা' (Tribal Sub-plans)-র সুবাদে সাক্ষরতার হারে সামান্য বৃদ্ধি ঘটে এবং তা ৮% থেকে ১২%-এ উন্নীত হয়; এ ক্ষেত্রে কয়লাখনি-অঞ্চলে অবস্থিত বিদ্যালয়গুলোর কারণে বর্ধমান জেলা এগিয়ে ছিল। অন্যদিকে, পাট শিল্পে মেয়েদের শ্রমের চাহিদার কারণে হুগলি জেলা সাক্ষরতার দৌড়ে কিছুটা পিছিয়ে পড়ে।

১৯৯১-২০০১ সালের সময়কালে, নগরায়নের ফলে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার হার বৃদ্ধি পাওয়ায় বর্ধমান জেলায় তফসিলি উপজাতি নারীদের সাক্ষরতার হার প্রায় ৪০% থেকে ৫০%-এ পৌঁছায়; একই সময়ে হুগলি জেলায় এই হার ছিল প্রায় ৩৫% থেকে ৪৫%, যা মূলত মেয়েদের ওপর

ন্যস্ত পারিবারিক ও গৃহস্থালি দায়িত্বের কারণে কিছুটা ব্যাহত হয়েছিল। ২০১১ সালের মধ্যে, বর্ধমান জেলা সাক্ষরতার হার ৬৫% থেকে ৭০%-এ উন্নীত করতে সক্ষম হয়, যেখানে হুগলি জেলার অবস্থান ছিল ৬০% থেকে ৬৩%-এর মধ্যে। 'সর্বশিক্ষা অভিযান' (SSA)-এর সহায়তায় উভয় জেলার সাক্ষরতার হারই বৃদ্ধি পেলেও, নারী ও পুরুষের সাক্ষরতার হারের মধ্যে ১৫% থেকে ২২%-এর একটি উল্লেখযোগ্য ব্যবধান বা 'লিঙ্গ-বৈষম্য' (gender gap) তখনও বিদ্যমান ছিল।

তুলনামূলক সারণি (তফসিলি উপজাতি নারীদের সাক্ষরতার আনুমানিক হার)

বছর	বর্ধমান (%)	হুগলি (%)	বর্ধমানের অগ্রগতি	প্রধান কারণ
1951	<2	<2	নেই	বিদ্যালয়ের অভাব, দারিদ্র্য
1961	~1.8	~1.5	+0.3 পয়েন্ট	প্রাথমিক আদিবাসী উন্নয়ন কর্মসূচি
1971	8-10	6-8	+2 পয়েন্ট	শিল্পাঞ্চলে অভিবাসন
1981	15-20	12-18	+3 পয়েন্ট	সাব-প্ল্যান চালু
1991	25-30	20-25	+5 পয়েন্ট	এনজিও ও সরকারি উদ্যোগ
2001	45-55	40-50	+5 পয়েন্ট	মধ্যাহ্ন ভোজন প্রকল্প
2011	65-70	60-63	+5-7 পয়েন্ট	সর্ব শিক্ষা অভিযান (SSA), নগরায়ন

শিক্ষাক্ষেত্রে ভিন্নতার চালিকাশক্তি: বর্ধমান জেলায় তফসিলি উপজাতিদের (ST) তুলনামূলকভাবে বড় অংশ (~৪.৪%) এবং খনি-সংক্রান্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ মেয়েদের শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের সংস্থান করেছিল, যার ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে অধিকতর স্থিতিশীল অগ্রগতি সাধিত হয়। অন্যদিকে, হুগলি জেলায় সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর ক্ষুদ্রতর উপস্থিতি (~১.২%) এবং কৃষিনির্ভর অর্থনীতির প্রবল প্রভাবের কারণে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার হার ছিল বেশি; অবশ্য কলকাতার নৈকট্য এক্ষেত্রে কিছুটা ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছিল। সমগ্র রাজ্যজুড়ে তফসিলি উপজাতিভুক্ত নারীদের শিক্ষার হার ১৯৬১ সালের ১.৭৬% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১১ সালে ৪৭.৭১%-এ উন্নীত হয়; এই দুই জেলার শিক্ষার হারই রাজ্যের গড় হারের চেয়ে বেশি হলেও, বর্ধমান জেলা এক্ষেত্রে অগ্রগামী ছিল।

11. বর্ধমান ও হুগলি জেলায় সাঁওতাল নারীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার তুলনা (১৯৫১-২০১১)

বর্ধমান ও হুগলি জেলায় সাঁওতাল নারীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার ক্ষেত্রে ১৯৫১ থেকে ২০১১ পর্যন্ত ধীরে ধীরে উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। তবে সামগ্রিকভাবে বর্ধমান জেলায় উন্নয়নের হার বেশি

ছিল, কারণ সেখানে শিল্পভিত্তিক অর্থনীতি ও সাঁওতাল জনসংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি। অন্যদিকে, হুগলি জেলা মূলত কৃষিনির্ভর হওয়ায় এবং শ্রম অভিবাসনের চাপ থাকায় উন্নয়নের গতি কিছুটা ধীর ছিল।

সাক্ষরতার তুলনা: বর্ধমান জেলায় ST নারীদের সাক্ষরতার হার ১৯৫১ সালে ২% এর নিচে থেকে ২০১১ সালে প্রায় ৬৫-৭০% এ পৌঁছায়, যেখানে খনি ও শিল্পখাতে কর্মসংস্থান শিক্ষায় বিনিয়োগে সহায়ক হয়েছে। হুগলি জেলায় একই সময়ে সাক্ষরতা বেড়ে ৬০-৬৩% হলেও, পাটশিল্পে শ্রমের কারণে অনেক মেয়ে বিদ্যালয় থেকে বাদ পড়ে, ফলে অগ্রগতি তুলনামূলকভাবে কম ছিল।

অর্থনৈতিক প্রবণতা: ১৯৫১-১৯৭১ সময়ে উভয় জেলায় সাঁওতাল নারীরা প্রধানত জীবিকাভিত্তিক কৃষি ও অবৈতনিক শ্রমে নিয়োজিত ছিলেন এবং দারিদ্র্যের হার ছিল ৭০% এর বেশি। বর্ধমানে কয়লা খনি ও শিল্পখাতে নারীদের জন্য প্রাথমিক মজুরিভিত্তিক কাজের সুযোগ তৈরি করে। ১৯৯১-২০১১ সময়ে বর্ধমানে নারীদের কর্মসংস্থান আংশিক দক্ষ কাজে (WPR ~৩০-৪০%) রূপান্তরিত হয় এবং দারিদ্র্য কমে প্রায় ২৫% এ নামে, যেখানে হুগলিতে অনেক নারী এখনও নিম্ন মজুরির টেক্সটাইল ও অনানুষ্ঠানিক খাতে (WPR ~৩৫-৪৫%) রয়ে যান।

সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন: সামাজিক দিক থেকে বর্ধমান জেলায় স্বনির্ভর গোষ্ঠী (SHGs), স্বাস্থ্যসেবা ও নগরায়নের ফলে নারীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং শিশুবিবাহের হার কমেছে। বিপরীতে, হুগলিতে পিতৃতান্ত্রিক প্রথা ও শ্রম অভিবাসনের কারণে নারীদের শোষণ ও সীমিত ক্ষমতায়ন লক্ষ্য করা যায়।

তুলনামূলক সারণি

দিক	বর্ধমান (১৯৫১ → ২০১১)	হুগলি (১৯৫১ → ২০১১)	প্রধান পার্থক্য
সাক্ষরতা (ST নারী)	<2% → 65-70%	<2% → 60-63%	বর্ধমান +৫-৭ পয়েন্ট এগিয়ে
দারিদ্র্যের হার	70%+ → ~25%	70%+ → ~30-35%	শিল্প বনাম কৃষিনির্ভরতা
কর্মসংস্থান (WPR)	কায়িক শ্রম → 30-40% আংশিক দক্ষ	কায়িক শ্রম → 35-45% অনানুষ্ঠানিক	বর্ধমানে উন্নত সুযোগ বেশি
সামাজিক ক্ষমতায়ন	মাব্বারি (SHGs, স্বাস্থ্য)	কম (রীতি-নীতি, কষ্টকর শ্রম)	বর্ধমানে নগরায়নের প্রভাব বেশি

সারণিটি থেকে বোঝা যায় যে ১৯৫১ থেকে ২০১১ পর্যন্ত বর্ধমান ও হুগলি উভয় জেলায় সাঁওতাল নারীদের অবস্থার উন্নতি হয়েছে, তবে বর্ধমান সব ক্ষেত্রেই কিছুটা এগিয়ে। সাক্ষরতার ক্ষেত্রে বর্ধমান ৬৫-৭০% এ পৌঁছায়, যেখানে হুগলি ৬০-৬৩%। দারিদ্র্যও বর্ধমানে বেশি কমে (~২৫%) তুলনায় হুগলিতে (~৩০-৩৫%)। কর্মসংস্থানে বর্ধমানে কিছুটা দক্ষ কাজের সুযোগ বৃদ্ধি পেলেও, হুগলিতে অধিকাংশ নারী এখনও অনানুষ্ঠানিক ও কম মজুরির কাজে যুক্ত। সামাজিক দিক থেকেও বর্ধমানে স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও নগরায়নের প্রভাবে উন্নতি বেশি, যেখানে হুগলিতে প্রথাগত বাধা এখনও বিদ্যমান।

12.১৯৫১-২০১১ সময়কালে সাঁওতাল নারীদের উন্নয়নে সরকারি প্রকল্প

১৯৫১ থেকে ২০১১ পর্যন্ত বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প সাঁওতাল নারীদের শিক্ষা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বিশেষ করে পাঁচ-সালা পরিকল্পনা, ট্রাইবাল সাব-প্ল্যান এবং নারী-কেন্দ্রিক উদ্যোগগুলির মাধ্যমে দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা এবং প্রচলিত লিঙ্গ বৈষম্য দূর করার চেষ্টা করা হয়েছে, যা বর্ধমান ও হুগলি জেলার মতো অঞ্চলে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

প্রারম্ভিক কল্যাণমূলক প্রকল্প (১৯৫১-১৯৭০ দশক): প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৫১-৫৬) অনুযায়ী সেন্ট্রাল সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার বোর্ড (CSWB) গঠিত হয়, যা মহিলামণ্ডলের মাধ্যমে সাঁওতাল নারীদের দক্ষতা উন্নয়ন ও সামাজিক উন্নয়নে সহায়তা করে। পরবর্তীতে মাতৃকালীন সুবিধা, ক্রেস ও সমান মজুরির উদ্যোগ চালু হয়।

ট্রাইবাল উন্নয়ন পর্যায় (১৯৭০-১৯৯০ দশক): ১৯৭৪ সালের ট্রাইবাল সাব-প্ল্যান (TSP) সাঁওতাল এলাকায় শিক্ষা ও অবকাঠামো উন্নয়নে অর্থ বরাদ্দ করে। ITDA-এর মাধ্যমে মেয়েদের জন্য বৃত্তি ও হোস্টেলের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৯২ সালের ৭৩তম সাংবিধানিক সংশোধনের মাধ্যমে পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় সাঁওতাল নারীদের জন্য সংরক্ষণ চালু হয়, যা তাদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বাড়ায়।

শিক্ষা ও ক্ষমতায়ন (১৯৯০-২০১১): ২০০১ সালের সর্ব শিক্ষা অভিযান (SSA) বিনামূল্যে শিক্ষা, মধ্যাহ্নভোজন ও ইউনিফর্মের মাধ্যমে মেয়েদের বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বাড়ায়। ১৯৯৯ সালের SGSY প্রকল্প স্বনির্ভর গোষ্ঠী (SHG) গঠনের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ঋণ ও জীবিকায়ন উন্নয়নে সহায়তা করে।

প্রকল্পভিত্তিক সংক্ষিপ্ত সারণি

প্রকল্প	চালুর বছর	সাঁওতাল নারীদের জন্য প্রধান সুবিধা
CSWB / মহিলামণ্ডল	১৯৫১-৫৬	কল্যাণ, দক্ষতা উন্নয়ন, ট্রেস
ট্রাইবাল সাব-প্ল্যান / ITDA	১৯৭৪	শিক্ষা, বৃত্তি, অবকাঠামো
পঞ্চায়েতি রাজ (৭৩তম সংশোধনী)	১৯৯২	রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, নেতৃত্ব
সর্ব শিক্ষা অভিযান (SSA)	২০০১	সর্বজনীন শিক্ষা, মধ্যাহ্নভোজন
SGSY (SHG)	১৯৯৯	ঋণ সুবিধা, জীবিকায়ন উন্নয়ন

সারণিটি সংক্ষেপে দেখায় যে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প সাঁওতাল নারীদের ধাপে ধাপে উন্নয়নে সহায়তা করেছে। প্রথমদিকে কল্যাণ ও দক্ষতা উন্নয়ন (CSWB), পরে শিক্ষা ও বৃত্তি (TSP/ITDA), তারপর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ (পঞ্চায়েতি রাজ), এবং শেষে শিক্ষা ও অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা (SSA, SGSY) – এই ধারাবাহিক উদ্যোগগুলির মাধ্যমে সাঁওতাল নারীদের সামগ্রিক ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পেয়েছে।

13. বর্ধমান ও হুগলি জেলায় সাঁওতাল নারীদের স্বাস্থ্য সূচকের তুলনা

বর্ধমান ও হুগলি জেলায় সাঁওতাল নারীরা দীর্ঘদিন ধরে অপুষ্টি, রক্তাল্পতা (অ্যানিমিয়া) এবং সীমিত স্বাস্থ্যসেবার মতো সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। তবে বর্ধমানে শিল্পভিত্তিক অর্থনীতি ও নগর এলাকার নিকটবর্তীতার কারণে স্বাস্থ্য সূচক কিছুটা উন্নত দেখা যায়, যেখানে হুগলিতে কৃষিনির্ভর জীবনযাত্রা ও শ্রমনির্ভর কাজের কারণে অপুষ্টির হার তুলনামূলক বেশি।

প্রধান স্বাস্থ্য সূচক: বর্ধমানে সাঁওতাল নারীদের গড় BMI প্রায় ১৮.৫-১৯.৫ কেজি/মি^২, যেখানে ২৫-৩৫% ক্ষেত্রে ক্রনিক এনার্জি ডেফিসিয়েন্সি (CED) দেখা যায়। হুগলিতে গড় BMI কিছুটা কম (১৮.১-১৮.৫) এবং CED এর হার ৩০-৪০%। অ্যানিমিয়া উভয় জেলায়ই উচ্চ (৬০-৭০%), তবে বর্ধমানে খাদ্য বৈচিত্র্য ও স্বাস্থ্যসেবার সুবিধা কিছুটা বেশি হওয়ায় পরিস্থিতি সামান্য ভালো। মাতৃস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেও বর্ধমানে কিছু উন্নতি লক্ষ্য করা যায়, যেখানে হুগলিতে শ্রমনির্ভরতা ও স্বাস্থ্যসেবার সীমাবদ্ধতার কারণে সমস্যা বেশি।

তুলনামূলক সারণি

সূচক	বর্ধমান (প্রায়)	হুগলি (প্রায়)	বর্ধমানের অগ্রগতি
------	------------------	----------------	-------------------

BMI (গড় কেজি/মি ^২)	18.5–19.5	18.1–18.5	+0.5 (কম CED)
CED এর হার	25–35%	30–40%	পুষ্টির ভালো প্রাপ্যতা
অ্যানিমিয়া (নারী)	60–65%	65–70%	খাদ্য ও আয়ের সুবিধা
মাতৃস্বাস্থ্য	মার্বারি উন্নতি	তুলনামূলক খারাপ	নগর স্বাস্থ্যসেবার প্রভাব

প্রভাবকারী কারণ: বর্ধমানের কয়লা ও শিল্পখাত নারীদের আয় বাড়িয়ে খাদ্যের বৈচিত্র্য উন্নত করেছে, ফলে অপুষ্টি কিছুটা কমেছে। অন্যদিকে, হুগলিতে মৌসুমি কাজ, ঘন ঘন গর্ভধারণ এবং সীমিত স্বাস্থ্যসেবার কারণে সমস্যা বেশি রয়ে গেছে। যদিও ICDS-এর মতো সরকারি প্রকল্প উভয় জেলায় কিছু উন্নতি এনেছে, তবুও সাঁওতাল নারীরা এখনও গড় উচ্চতা (১৫১–১৫২ সেমি) ও ওজনের দিক থেকে অন্যান্য সম্প্রদায়ের তুলনায় পিছিয়ে রয়েছে।

14. পরামর্শ & উপসংহার (Suggestions and Conclusion)

পরামর্শ Suggestions: এই গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে, বর্ধমান ও হুগলি জেলার সাঁওতাল নারীদের আর্থ-সামাজিক ও শিক্ষাগত অবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে বেশ কিছু নীতি-ভিত্তিক এবং ব্যবহারিক পরামর্শ প্রস্তাব করা যেতে পারে। প্রথমত, আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে শিক্ষাগত অবকাঠামো শক্তিশালী করা প্রয়োজন-বিশেষ করে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে। আরও বেশি বিদ্যালয় স্থাপন, যাতায়াত ব্যবস্থার সুবিধা প্রদান এবং প্রশিক্ষিত শিক্ষক-বিশেষ করে নারী শিক্ষক-নিয়োগের মাধ্যমে সাঁওতাল ছাত্রীদের মধ্যে পড়াশোনা ছেড়ে দেওয়ার হার (dropout rates) কমাতে সহায়তা পাওয়া যেতে পারে।

দ্বিতীয়ত, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং নারীর অধিকারের গুরুত্ব প্রচারের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট সচেতনতা কর্মসূচি পরিচালনা করা উচিত। স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও নারী গোষ্ঠীগুলোকে সম্পৃক্ত করে পরিচালিত কমিউনিটি-ভিত্তিক উদ্যোগগুলো প্রথাগত মানসিকতা পরিবর্তনে এবং উন্নয়নমূলক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

তৃতীয়ত, স্থানীয় চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ দক্ষতা উন্নয়ন ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। স্ব-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসার এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলোকে (SHGs) শক্তিশালী করার মাধ্যমে সাঁওতাল নারীদের আর্থিক স্বাধীনতা বৃদ্ধি করা সম্ভব। পাশাপাশি, ক্ষুদ্রঋণ ও ঋণ সুবিধা প্রাপ্তির সুযোগও উন্নত করা প্রয়োজন।

চতুর্থত, সরকারি কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলো আরও কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা আবশ্যিক। প্রকল্পগুলোর সুফল যেন প্রকৃত সুবিধাভোগীদের কাছে পৌঁছায়, তা নিশ্চিত করার জন্য যথাযথ তদারকি, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার ব্যবস্থা থাকা অপরিহার্য। আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই প্রকল্পগুলো সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যেও প্রচেষ্টা চালানো উচিত।

পঞ্চমত, বাল্যবিবাহ, লিঙ্গবৈষম্য এবং স্বাস্থ্যগত চ্যালেঞ্জের মতো সামাজিক সমস্যাগুলোর সমাধান করা অত্যন্ত জরুরি। মাতৃস্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতার ওপর গুরুত্ব দিয়ে বিশেষ কর্মসূচি চালু করা প্রয়োজন।

পরিশেষে, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সাংস্কৃতিক সংবেদনশীলতা বজায় রেখে উন্নয়নমূলক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা উচিত। টেকসই ও সমতাভিত্তিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রণীত নীতিমালায় সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর অনন্য আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটকে অবশ্যই বিবেচনায় রাখতে হবে। দীর্ঘমেয়াদী অগ্রগতি অর্জনের জন্য সরকারি সংস্থা, বেসরকারি সংস্থা (NGO) এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে সম্মিলিত প্রচেষ্টা একান্ত অপরিহার্য।

উপসংহার (Conclusion): বর্তমান গবেষণাটি ১৯৫১ থেকে ২০১১ সালের মধ্যবর্তী সময়ে বর্ধমান ও হুগলি জেলার সাঁওতাল নারীদের আর্থ-সামাজিক ও শিক্ষাগত বিবর্তনের একটি বিস্তারিত বিশ্লেষণ প্রদান করে। এতে দেখা যায় যে, সাক্ষরতা, সচেতনতা এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হলেও, এই উন্নয়নের প্রক্রিয়াটি ছিল ধীরগতিসম্পন্ন, অসম এবং তা ছিল নানাবিধ দীর্ঘস্থায়ী চ্যালেঞ্জে জর্জরিত।

স্বাধীনতার পরবর্তী প্রাথমিক পর্যায়ে, সাঁওতাল নারীরা মূলত জীবনধারণ-নির্ভর কৃষি এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমকাজে নিয়োজিত ছিলেন; সেসময় শিক্ষা ও প্রাতিষ্ঠানিক সম্পদের ক্ষেত্রে তাঁদের প্রবেশাধিকার ছিল অত্যন্ত সীমিত। বিগত কয়েক দশক ধরে, শিক্ষাগত সুযোগ-সুবিধার প্রসার, বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের বাস্তবায়ন এবং বৃহত্তর আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনসমূহ তাঁদের সামাজিক মর্যাদার দৃশ্যমান উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। শিক্ষা তাঁদের ক্ষমতায়নের একটি মূল চালিকাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে, যা নারীদের উন্নত সুযোগ-সুবিধা লাভে এবং তাঁদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সক্ষম করে তুলেছে।

তবে, এই অগ্রগতি সত্ত্বেও, বেশ কিছু কাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা তাঁদের সামগ্রিক উন্নয়নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দারিদ্র্য, লিঙ্গবৈষম্য, বাল্যবিবাহ এবং উচ্চশিক্ষা ও প্রাতিষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সীমিত প্রবেশাধিকারের মতো বিষয়গুলো এখনও গভীর উদ্বেগের কারণ হয়ে রয়েছে। উন্নয়নের

সুফল সকলের মাঝে সমানভাবে বণ্টিত হয়নি এবং অনেক সাঁওতাল নারীই এখনও প্রান্তিকতার শিকার হচ্ছেন।

এই গবেষণাটি উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি সামগ্রিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের গুরুত্বের ওপর আলোকপাত করে, যেখানে অর্থনৈতিক ও আর্থ-সাংস্কৃতিক-উভয় প্রকার বিষয়কেই বিবেচনায় রাখা হয়। এতে জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, কার্যকর নীতি বাস্তবায়ন, জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং লিঙ্গসমতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদানের মাধ্যমেই কেবল টেকসই অগ্রগতি অর্জন করা সম্ভব।

পরিশেষে বলা যায় যে, ১৯৫১ থেকে ২০১১ সালের মধ্যবর্তী সময়ে সাঁওতাল নারীদের সামাজিক মর্যাদায় যে রূপান্তর ঘটেছে, তা একদিকে যেমন অগ্রগতির চিত্র তুলে ধরে, তেমনি অন্যদিকে বিদ্যমান বৈষম্যগুলোর অব্যাহত উপস্থিতিও নির্দেশ করে। বর্তমান ব্যবধানগুলো দূর করতে এবং উন্নয়নের সুফল যেন সমাজের সকল স্তরের মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারে—তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া প্রয়োজন; আর এর মাধ্যমেই সামাজিক ন্যায়বিচার ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

References

1. Das, S. (2017). Socio-economic status and educational development of Santal women in West Bengal. *International Journal of Social Science Studies*, 5(4), 45–52.
2. Malakar, P., & Roy, B. (2017). Socio-economic determinants of fertility among Santal women in West Bengal. *Asian Journal of Social Science Research*, 2(1), 23–34.
3. Stiller, C. K., et al. (2020). Maternal and child nutrition practices among Santal communities in India. *BMC Public Health*, 20(1), 1–12. <https://doi.org/10.1186/s12889-020-08967-5>
4. Roy, A. (2015). Socio-economic and environmental conditions of Santal community: A case study. *Journal of Tribal Studies*, 8(2), 67–78.
5. Farabi, S. (2023). Role of education in empowering Santali women in India. *International Journal of Interdisciplinary Research*, 9(2), 112–120.
6. Soren, M., Murmu, S., & Hansda, R. (2023). Socio-economic characteristics of Santal women in livestock farming. *The Pharma Innovation Journal*, 12(10), 2450–2455.
7. Bhunia, R. (2025). Gender disparity in education among tribal women in West Bengal. *International Journal of Creative Research Thoughts*, 13(1), 210–218.

8. Dutta, S., & Sati, V. P. (2025). Socio-economic development of tribal communities in eastern India. *Journal of Development Studies*, 15(1), 55–70.
9. Ghosh, M., & Adhikari, S. (2025). Health and socio-economic status among Santal population in West Bengal. *International Journal of Health Sciences*, 11(3), 89–97.
10. Government of India. (2011). *Census of India 2011: Primary census abstract*. Office of the Registrar General & Census Commissioner.
